শার‘ঈ মানদণ্ডে তাবীয-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আব্দুল আলীম ইবন কাওসার

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2015 - 1436

IslamHouse.com

﴿ التمائم والرقى في ميزان الشرع ﴾

« باللغة البنغالية »

عبد العليم بن كوثر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2015 - 1436

IslamHouse.com

শারঈ মানদণ্ডে তাবীয-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য। ছালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে না, তার ঈমান নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ۝٢٣﴾ [المائدة: ٢٣]

'আর তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা কর- যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(আল-মায়েদাহ, ২৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢﴾ [الانفال: ٢]

'যারা মুমিন, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আল-আনফাল ৩)*। বুঝা গেল, আল্লাহ্র উপর ভরসা ঈমানের অন্যতম একটি শর্ত। আর আল্লাহ্র উপর ভরসার অর্থ হচ্ছে, বান্দা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে যে, সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে। তিনি যা চান, তা হয়। পক্ষান্তরে যা তিনি চান না, তা হয় না। উপকার ও

ক্ষতি সাধন সবকিছুই তাঁর হাতে। তিনি যাকে যা খুশী দেন আর যাকে যা খুশী দেন না। নেই কোনো ক্ষমতা এবং নেই কোনো শক্তি তিনি ব্যতীত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেন, 'হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাণী শিক্ষা দেব: (সেগুলি হচ্ছে) আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের হেফাযত করবে, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। আর যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছেই চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখো, দুনিয়ার সবাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন, তার বাইরে কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকারও তারা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে আল্লাহ যতটুকু তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন, তার বাইরে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ক্ষতিও তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ তাক্বদীর লেখা শেষ হয়ে গেছে)' *(মুসনাদে আহমাদ, ১/২৯৩)*। অতএব, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বান্দার কাঙ্খিত বস্তু হাছিলের এবং অনাকাঙ্খিত বস্তু প্রতিহতের অন্যতম কারণ ও মাধ্যম। সেজন্য যে ব্যক্তি এসব কারণকে অস্বীকার করবে, তার আল্লাহ্‌র উপর ভরসার

বিষয়টি সঠিক প্রমাণিত হবে না। এসব কারণকে স্বীকার করার অর্থ এগুলির উপর ভরসা করা নয়। বরং এসব কারণের উপর নির্ভর না করা আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসার অন্তর্ভুক্ত। মূলকথা, বান্দার পূর্ণ ভরসা ও নির্ভরতা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর উপর, অন্য কিছুর উপর নয়।

কিন্তু আল্লাহ্‌র উপর বান্দার ভরসা যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার অন্তর বিভিন্ন কারণ ও মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং ঐ কারণসমূহের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। কখনও কখনও আল্লাহ সম্পর্কে তার গাফলতি বৃদ্ধি পেয়ে শরী'আত অনোনুমোদিত কারণের উপর সে নির্ভর করতে শুরু করে। যুগে যুগে তাবীয ব্যবহারকারীদের অবস্থা এটাই। অত্র সংকলনে শারঈ মানদণ্ডে তাবীয-কবচ ও ঝাড়-ফুঁকের বিভিন্ন দিকের উপর নাতিদীর্ঘ একটি বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ক্ষুদ্র এই প্রয়াসটুকু কবূল করুন। আমীন!

'তাবীয'-এর পরিচয়

অসুখ-বিসুখ, চোখ লাগা বা বদনযর, জাদু, জিন-শয়তানের আছর ইত্যাদি কোনো সম্ভাব্য বা ঘটিত অকল্যাণ দূর করতে অথবা কোনো কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে পূতিঁ, কাঠ, হাড়, সূতা, কাগজ ইত্যাদি দেহে, গৃহে, গাড়ীতে বা অন্য কিছুতে ঝুলানোকে 'তাবীয' বলে। এই অর্থে

যিক্‌র-আযকার ও দু‘আ চামড়া, কাগজ বা অন্য কিছুতে লিখে ঝুলালে তাও তাবীযের আওতায় পড়বে। বাসা-বাড়ীর ফটকে বা কোনো স্থানের সম্মুখভাগে ঘোড়ার পায়ের নাল ঝুলানোও তাবীযের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে গাড়ীর পেছনে বা সামনে জুতা-সেন্ডেল ঝুলানো বা গাড়ীর ভেতরের আয়নায় নীল পুঁতি, তাসবীহ ইত্যাদি ঝুলানোও তাবীযের অন্তর্ভুক্ত। এসব জিনিস রোগীর বা সাধারণ কোনো ব্যক্তির বালিশ বা বিছানার নীচে অথবা অন্য কোথাও বিশেষ নিয়্যতে রাখলে তাও তাবীয বলে গণ্য হবে।

জাহেলী যুগে ‘তাবীয’

‘তাবীয’ ছিল জাহেলী যুগের বহুলপ্রচলিত একটি বিষয়। সম্ভাব্য অসুখ-বিসুখ, চোখ লাগা, নানা বিপদাপদ, বালা-মুছীবত ইত্যাদি থেকে নিজেদেরকে এবং গৃহপালিত পশুকে বাঁচানোর জন্য জাহেলী যুগের লোকেরা ‘তাবীয’ ঝুলাতো। ক্ষতিকর আত্মার -তাদের বিশ্বাস মতে- উপর বিজয় লাভও তাদের তাবীয ঝুলানোর আরেকটি অন্যতম কারণ ছিল।

জাহেলী যুগের আরবরা যখন নির্জন কোনো প্রান্তে যেত, তখন তারা জিন, শয়তান ইত্যাদির ক্ষতির আশঙ্কা করত। ফলে তাদের একজন দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে বলত, আমরা এই উপত্যকার ছোট ছোট জীনগুলো থেকে বাঁচার জন্য বড় সরদারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাদের বিশ্বাস মতে, এই আশ্রয় প্রার্থনার কারণে কেউ তাদের ক্ষতি করত না।

এই শির্কী আশ্রয় প্রার্থনার পাশাপাশি জাহেলী যুগের লোকেরা জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পশু কুরবানীর মাধ্যমে তাদের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস চালাত। কেউ বাড়ী বানালে বা কূপ খনন করলে সে জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পশু যবেহ করত।

তারা বিশ্বাস করত, কিছু কিছু পাথর, গাছ, প্রাণী এবং খণিজ পদার্থে এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাদেরকে জিনের ক্ষতি এবং মানুষের বদনযর থেকে বাঁচাতে পারে। সেজন্য তারা সেগুলিকে তাবীয হিসাবে ঝুলাত এবং সেগুলির উপর তাদের অন্তঃকরণসমূহকে নির্ভরশীল করে ফেলত। এ সবকিছুর মূলে ছিল মহান প্রভূ সম্পর্কে তাদের চরম মূর্খতা ও অজ্ঞতা এবং তাঁর প্রতি তাদের অনাস্থা। সেকারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তাবীযের সমারোহ দেখা যেত। যেমন:

১. 'নুফরা' নামক এক প্রকার তাবীয, যা তারা চোখ লাগার ভয়ে বাচ্চাদের দেহে ঝুলাত। কখনও কখনও তারা এই নুফরাকে অপবিত্র জিনিস দিয়ে তৈরী করত। যেমন: হায়েযের নেকড়া। আবার কখনও তা তৈরী করত নিকৃষ্ট নাম দিয়ে।

২. শিয়াল বা বিড়ালের দাঁত।

৩. 'আক্বরা' নামের এক প্রকার তাবীয, যা মহিলারা গর্ভধারণ না করার অভিপ্রায়ে কোমরে বাঁধত।

৪. ‘ইয়ানজালিব’ নামক এক প্রকার তাবীয, যা রাগান্বিত স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তার সহানুভূতি লাভের জন্য ব্যবহার করা হত।

৫. ‘তিওয়ালা’ নামের এক প্রকার তাবীয, যা স্বামীর ভালোবাসা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত।

৬. ‘ক্বুবলা’ নামের এক প্রকার সাদা পুঁতি, যা চোখ লাগা থেকে রক্ষার জন্য ঘোড়ার গলায় ঝুলানো হত।

৭. ‘তাহ্‌বীতা’ নামক লাল এবং কালো রংয়ের পাকানো সূতা, যা মহিলারা চোখ লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাজায় বেঁধে রাখত।

ইসলাম পরবর্তী যুগে ‘তাবীয’

জাহেলী যুগের মানুষ কল্যাণ সাধনে ও অকল্যাণ দূরীকরণে আল্লাহকে ছেড়ে তাবীয-কবচের উপর নির্ভর করত, যা মূর্খতা, ভ্রষ্টতা এবং শির্ক বৈ আর কিছুই নয়। তাওহীদের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক হওয়ায় ইসলাম কঠোরভাবে তাবীযকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ক্বায়েস ইবনে সাকান আল-আসাদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর দেহে লাল তাবীয দেখতে পেয়ে তা ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, “নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহর পরিবার শির্কমুক্ত”। তিনি আরো বললেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছ থেকে এই হাদীছটি মুখস্থ করেছি: নিশ্চয়ই (নিষিদ্ধ) ঝাড়ফুঁক, তাবীয

এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী বিশেষ তাবীয (তিওয়ালা) শির্কের অন্তর্ভুক্ত[1]। তাবীয নিষিদ্ধকারী আরো কিছু অকাট্য দলীল 'পবিত্র কুরআনকে বা কুরআনের কোনো আয়াতকে তাবীয হিসাবে ব্যবহার প্রসঙ্গ' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামে তাবীয ঝুলানোর বিধান

তাবীয কি দিয়ে তৈরী, তাবীয ঝুলানোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি, তাবীয ঝুলানোর পেছনে তাবীয ব্যবহারকারীর বিশ্বাসইবা কি- এ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে তাবীযের বিধানও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন:

১. জিন, শয়তান, মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে লিখিত তাবীয: এ প্রকার তাবীয বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার তাবীয ব্যবহারকারী ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং পরকালে সে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হবে। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে এমন বিষয়ের সাহায্য প্রার্থনা করা শির্ক, যে বিষয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা তার নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ﴾ [الزمر: ٣٨]

---

[1] *(মুস্তাদরাক হাকেম, তিনি হাদীছটিকে 'ছহীহুল ইসনাদ' বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। আলবানী 'সিলসিলা ছহীহাহ'তে হাদীছটি নিয়ে এসেছেন, হা/৩৩১)।*

‘বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে?’ *(আয-যুমার, ৩৮)*।

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে শির্ক করল’ *(আহমাদ, হাকেম)*।

২. বিভিন্ন প্রকার নকশা, চিত্র, জাদুমন্ত্র, নাম, শব্দ সম্বলিত তাবীয, যেগুলির অর্থ বোধগম্য নয়: এ প্রকারের তাবীয হারাম। কেননা এগুলি মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়।

৩. বালা-মুছীবত দূর করার জন্য পুঁতি, রিং, সূতা, আংটি ইত্যাদি ঝুলানো: এগুলি ঝুলিয়ে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, খোদ এগুলি বালা-মুছীবত দূর করতে সক্ষম, তাহলে সে বড় শির্ক করল। কেননা সে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুকে শরীক স্থাপন করল। পক্ষান্তরে যদি সে বিশ্বাস করে যে, উপকার-ক্ষতি শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র হাতে; কিন্তু পুঁতি, রিং, সূতা, আংটি ইত্যাদি কারণ মাত্র, তাহলে সে এমন কিছু বস্তুকে কারণ বানালো, যেগুলিকে আল্লাহ কারণ বানান নি। ফলে এই বিশ্বাস রেখে ঐসব জিনিস ঝুলালে তা হারাম বলে গণ্য হবে এবং ছোট শির্কে পরিণত হবে।

মোদ্দাকথা: এগুলির ব্যবহারকারী যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এসব জিনিসের নিজস্ব শক্তি রয়েছে, তাহলে সে বড় শির্ককারী হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি সে বিশ্বাস করে যে, সবকিছু আল্লাহ্‌র হাতে; কিন্তু এগুলি মাধ্যম মাত্র এবং এগুলির নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, তাহলে সে ছোট শির্ককারী হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সে শরী'আতে অনোনুমোদিত কারণকে কারণ হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে তার অন্তর ঝুঁকে পড়েছে। তার অন্তর যদি এসব জিনিসের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সে এগুলির মাধ্যমে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূরীকরণের আশা করে, তাহলে তার এই আমল বড় শির্কের মাধ্যম হিসাবে গণ্য হবে।

৪. কুরআনের আয়াত, হাদীছ বা মাসনূন দু'আ সম্বলিত তাবীয: এ প্রকারের তাবীয নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে, যে সম্পর্কে অত্র সংকলনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তাবীয কখন 'বড় শির্ক' হবে এবং কখন 'ছোট শির্ক' হবে?

কেউ যদি তাবীয ঝুলিয়ে আল্লাহ ব্যতীত তার ইবাদত করে, তাহলে তা 'বড় শির্ক' হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে তাবীয ব্যবহারকারী যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়াই এই তাবীযই তাকে হেফাযত করছে, তার রোগ-বালাই দূর করছে বা তার থেকে অকল্যাণ দূর করছে, তাহলে তাও 'বড় শির্ক' বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, এই তাবীয চোখ লাগা ও বালা-মুছীবত থেকে তার মুক্তির কারণ, তাহলে তা 'ছোট শির্ক' হিসাবে গণ্য হবে।

বড় শির্ক এবং ছোট শির্কের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, বড় শির্ককারীর উপর মুসলিম শাসক 'রিদ্দার হদ্' কায়েম করবে। আর তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝٦٥ ﴾ [الزمر: ٦٥]

'নিশ্চয়ই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহি হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(আয-যুমার, ৬৫)*।

ছোট শির্ক বলে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে, ছোট শির্ক অপরাপর কাবীরা গোনাহ বা বড় পাপের চেয়েও বড় পাপ *(ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবিত-তাওহীদ/১২১)*।

পবিত্র কুরআনকে বা কুরআনের কোনো আয়াতকে তাবীয হিসাবে ব্যবহার প্রসঙ্গ

কুরআন থেকে তাবীয বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন: (১) কাগজে পবিত্র কুরআনের আয়াত লিখে তাবীয হিসাবে ব্যবহার করা। (২)

কুরআন মাজীদকে খুব ছোট আকারে প্রিন্ট করে তাবীয হিসাবে ব্যবহার করা। (৩) কেউ কেউ কুরআন মাজীদকে দেহে না ঝুলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ায়। (৪) কেউ কেউ আবার কুরআনের আয়াতকে স্বর্ণ বা রৌপ্য খণ্ডে লিখে তা তাবীয হিসাবে ব্যবহার করে।

তাবীয যদি কুরআন ও মাসনূন দু'আ দিয়ে না হয়, তাহলে উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা হারাম। তবে তাবীয কুরআন ও মাসনূন দু'আ দিয়ে হলে তা ব্যবহার করা যাবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

প্রথম মত: তাবীয কুরআন দিয়ে হলেও তা ব্যবহার করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, উক্ববাহ ইবনে আমের, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আসওয়াদ, আলক্বামাহ, ইবরাহীম নাখাঈ (রহেমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ এমতের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তাঁদের দলীলসমূহ:

১. তাবীয নিষিদ্ধকারী দলীলসমূহে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাবীযের কোন্‌টি কুরআন থেকে এবং কোন্‌টি কুরআন থেকে নয়, সেগুলিতে এজাতীয় কোনো পার্থক্যের উল্লেখ নেই। আর উছূলে ফিক্বহের একটি মূলনীতি হচ্ছে, শরী'আতের সাধারণ কোনো আদেশ-নিষেধ (عام) সাধারণই থাকবে, যতক্ষণ তাকে নির্দিষ্টকারী

(مخصِّص) কোনো দলীল না আসবে। তাবীয নিষিদ্ধকারী সাধারণ দলীলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে:

(ক) উক্ববা ইবনে আমের আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে একটি দল আসলে তিনি তাঁদের ৯ জনের বায়'আত গ্রহণ করলেন, কিন্তু একজনের বায়'আত গ্রহণ করলেন না। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি ৯ জনের বায়'আত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এই ব্যক্তির বায়'আত গ্রহণ করলেন না? তিনি বললেন, তার দেহে তাবীয আছে। অতঃপর তিনি তাঁর হাত ঢুকিয়ে তাবীযটি ছিড়ে ফেললেন। এরপর তার বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে শির্ক করল'[2]।

(খ) তিনি অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই (নিষিদ্ধ) ঝাড়ফুঁক, তাবীয এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী বিশেষ তাবীয (তিওয়ালা) শির্কের অন্তর্ভুক্ত'[3]।

---

[2] (মুসনাদে আহমাদ, ১৫৬/৪; সিলসিলাহ ছহীহাহ, হা/৪৯২)।

[3] মুস্তাদরাক হাকেম, তিনি হাদীছটিকে 'ছহীহুল ইসনাদ' বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। আলবানী 'সিলসিলা ছহীহাহ' তে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, (হা/৩৩১)

(গ) আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে তার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে’[4]।

এসব হাদীছে সাধারণভাবে সব ধরনের তাবীয নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন্‌টি কুরআন থেকে এবং কোন্‌টি কুরআন থেকে নয়, তার কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

২. এই আমল যদি শরী‘আত সম্মত হত, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাঁর উম্মতকে তা বলে দিতেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যিক্‌র-আযকার ও দু‘আ সম্বলিত সবগুলি হাদীছ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেগুলিতে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি যিক্‌রটি বা দু‘আটি বলবে’, ‘যে ব্যক্তি যিক্‌রটি বা দু‘আটি পড়বে’। একটি হাদীছেও বলা হয়নি, ‘যে ব্যক্তি যিক্‌রটি বা দু‘আটি লিখবে’, ‘যে ব্যক্তি যিক্‌রটি বা দু‘আটি ঝুলাবে’। সেজন্য ইবনুল আরাবী (রহেমাহুল্লাহ) বলেছেন, কুরআন ঝুলানো সুন্নাত নয়; বরং সুন্নাত হচ্ছে, কুরআন তেলাওয়াত করা ও গবেষণা করা।

৩. শির্কের দ্বার বন্ধ করার মহান উদ্দেশ্যে এ প্রকারের তাবীযও অবৈধ হবে। আমরা যদি বলি যে, কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা লিখিত তাবীয বৈধ, তাহলে শির্কের দরজা উন্মুক্ত হবে এবং অবৈধ

[4] আলবানী, ছহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, (হা/৩৪৫৬)।

তাবীযের সাথে বৈধ তাবীযের সংমিশ্রণ ঘটে যাবে। ফলে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট দা'ঈরা এবং তাবীয ব্যবসায়ীরা এটিকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করবে।

৪. কুরআনকে তাবীয হিসাবে ব্যবহার করলে কুরআনের অবমাননা করা হয়। ব্যবহারকারী এই তাবীয নিয়ে টয়লেট, নাপাক স্থান ইত্যাদিতে গিয়ে থাকে, যেসব স্থানে কুরআন নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। আর ব্যবহারকারী যদি বাচ্চা হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

দ্বিতীয় মত: তাবীয যদি কুরআন থেকে হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা বৈধ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী প্রমুখ থেকে এই মতটি উল্লেখ করা হয়। নিম্নোক্ত হাদীছটি তাঁদের দলীল: রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে তার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে'[5]।

তাঁরা বলেন, উক্ত হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ব্যক্তি শির্কী তাবীয ঝুলাবে, তাকে সেদিকে ঠেলে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ কুরআন ঝুলালে স্বয়ং আল্লাহ তার দায়িত্ব নিবেন; তাকে তিনি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দিকে ঠেলে দিবেন না। কারণ ইসলামী শরী'আতে কুরআন দ্বারা আরোগ্য লাভের নির্দেশনা এসেছে।

---

[5] তিরমিযী, (হা/২০৭২; আহমাদ, ৪/৩১০; গায়াতুল মারাম, (হা/২৯৭)।

তাঁদের এই উপলব্ধির জবাবে বলা যায়, ইসলামী শরী‘আতে কুরআন দ্বারা আরোগ্য লাভের নির্দেশনা যেমন এসেছে, তেমনি কুরআন দ্বারা আরোগ্য লাভের পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে, কুরআন তেলাওয়াত, গবেষণা, কুরআনকে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ এবং শরী‘আত অনুমোদিত ঝাড়-ফুঁক। সুতরাং কেউ যদি সত্যিকার অর্থে কুরআন তেলাওয়াত করে, কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, কুরআনের অনুসরণ করে এবং এর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে, তাহলে সে সুস্থতা, নিরাপত্তা এবং শান্তি অর্জন করবেই; যা কুরআন ঝুলিয়ে অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়।

তাছাড়া কুরআন ঝুলালে যদি আল্লাহ দায়িত্ব নিয়ে নিতেন, তাহলে কুরআন তেলাওয়াতের প্রয়োজন পড়ত না; প্রয়োজন পড়ত না কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত যিক্র-আযকার ও দু‘আ পড়ার। ফলে এতোসব যিক্র-আযকার ও দু‘আ এবং শরী‘আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক অনর্থক হয়ে যেত।

আরেকটি বাস্তব বিষয় হচ্ছে, যখন কেউ কুরআনের আয়াতকে তাবীয বানিয়ে ঝুলায়, তখন তার মনটা আল্লাহ থেকে দূরে সরে ঐ তাবীযের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেজন্য দেখা যায়, তার কাছ থেকে ঐ তাবীয খুলে নিলেই সে বালা-মুছীবত ও বিপদাপদের ভয় পায়। অথচ আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা করলে কারো মনে কখনও এমন অবস্থার উদ্রেক হবে না।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, প্রথমোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য মত। কারণ এমতের পক্ষের দলীলগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী। তদুপরি এমতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে নির্ভেজাল ও কলুষমুক্ত রাখা সম্ভব হয়।

কুরআন দিয়ে তাবীয বানানো প্রসঙ্গে কয়েক জন আলেমের বক্তব্য:

- শায়খ সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহেমাহুল্লাহ) কুরআন দিয়ে তাবীয বানানো প্রসঙ্গে ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তৎপরবর্তী যুগের কতিপয় উলামায়ে কেরামের মধ্যকার মতভেদ উল্লেখ করার পর বলেন, ‘এই যদি হয় পবিত্র কুরআন এবং আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী ঝুলানো নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ, তাহলে তাঁদের পরে শয়তানদের নাম নিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা, তাদের নাম ঝুলানো, তাদের উপর নির্ভরশীল হওয়া, তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাদের নামে যবেহ করা, তাদের কাছে অকল্যাণ দূরীকরণ এবং কল্যাণ সাধনের প্রার্থনা করার মত যেসব স্পষ্ট শির্কের জন্ম হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?![6]’

---

[6] তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ: ১৩৬-১৩৮)

- শায়খ হাফেয হাকামী রহ. ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তৎপরবর্তী যুগের কতিপয় উলামায়ে কেরামের মধ্যকার মতভেদ উল্লেখ করে বলেন, ‘বিশেষ করে আমাদের এই যামানায় নিষিদ্ধ আক্বীদার দুয়ার বন্ধ করার মহান উদ্দেশ্যে এই প্রকারের তাবীযও যে নিষিদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা পাহাড় সদৃশ মযবূত ঈমানে বলিষ্ঠ বেশীর ভাগ ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন যেহেতু সেই সোনার যুগে কুরআন দিয়ে তৈরী তাবীয ঝুলানোকে অপছন্দ করেছেন, সেহেতু এই ফেৎনার যুগে তা অপছন্দ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয়। আজ তাবীয ব্যবসায়ীরা মতভেদের এই সুযোগকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে এটিকে স্পষ্ট হারামে পরিণত করছে। তারা তাবীযে কুরআনের আয়াত ও সূরা লিখে তার নীচে জাদুমন্ত্রের অদ্ভুত সব দাগ টানে এবং নানা ধরনের সংখ্যা লিখে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা থেকে মানুষের অন্তরকে ফিরিয়ে এনে তারা তাদের লিখিত জাদুমন্ত্রের দিকে তাদেরকে ঠেলে দেয়।...কিন্তু তাবীয যদি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দিয়ে না হয়, তাহলে তা ঝুলানো নিঃসন্দেহে শির্ক। কেননা তাবীয যেমন বালা-মুছীবত দূরীকরণের বৈধ

কোনো মাধ্যম নয়, তেমনি তা কোনো ওষুধ হিসাবেও গণ্য নয়[7]।

- শায়খ উছায়মীন কুরআনের আয়াত দিয়ে তৈরীকৃত তাবীয সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতভেদ উল্লেখ করার পর বলেন, তাবীয কুরআন দিয়ে তৈরী হলেও তা ঝুলানো বৈধ নয়। অনুরূপভাবে তা কোনো রোগীর বালিশের নীচে রাখা অথবা দেওয়াল বা অন্য কিছুতে ঝুলানোও বৈধ নয়[8]।

তাবীয কি রোগমুক্তির কারণ হতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٧ ﴾ [الانعام: ١٧]

‘আর যদি আল্লাহ তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউই নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ করেন, তবে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’। *(আল-আন‘আম, ১৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

---

[7] (মা‘আরেজুল ক্ববূল, ২/৫১০-৫১২)।

[8] (আল-মাজমূ আছ-ছামীন, ১/৫৮)।

﴿ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧ ﴾ [يونس: ١٠٧]

‘আর যদি আল্লাহ তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউই নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ করতে চান, তবে তার মেহেরবানীকে অপসারণকারী কেউই নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান, তাকে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। বস্তুত তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু’ *(ইউনুস, ১০৭)*। উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মত পবিত্র কুরআনের আরো বহু আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অনিষ্ট দূর করতে পারে না। সেজন্য বান্দা কল্যাণ অর্জনে এবং অকল্যাণ দূরীকরণে সেই আল্লাহ্‌র নিকটেই আশ্রয় গ্রহণ করবে। কারণে বা কারণ ছাড়াই মহান আল্লাহ কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূরীকরণ উভয়ই করতে পারেন।

আর যেসব কারণে আল্লাহ বান্দার কল্যাণ বা অকল্যাণ করেন, সেগুলি দুই ধরনের:

(১) শরী‘আত অনুমোদিত কারণ: মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা যেগুলিকে ‘কারণ’ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলি শরী‘আত অনুমোদিত কারণ বলে গণ্য হবে।

যেমন: দু'আ, শরী'আতসম্মত ঝাড়-ফুঁক। এগুলি আল্লাহ্র ইচ্ছায় বান্দার কল্যাণ লাভের বা অকল্যাণ দূরীকরণের শরী'আত সম্মত কারণ হিসাবে পরিগণিত। সুতরাং যারা এই কারণগুলিকে কারণ হিসাবে গ্রহণ করবে, মূলতঃ তারা আল্লাহ্র নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা খোদ আল্লাহই সেগুলিকে কারণ হিসাবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, বান্দা শুধুমাত্র তার উপরই নির্ভর করবে; কারণের উপরে নয়। এর অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে, যে মহান সত্ত্বা সেগুলিকে কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তিনি সেগুলির প্রভাব অকেজো করে দিতে পারেন। অতএব, সর্বাবস্থায় কেবলমাত্র তাঁর উপরেই নির্ভর করতে হবে।

(২) স্বাভাবিক কারণ: যেমন: পানি পান পিপাসা নিবারণের কারণ, পোষাক পরিধান শীত নিবারণের কারণ। অনুরূপভাবে বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী ওষুধও স্বাভাবিক কারণ হিসাবে গণ্য হবে। এ দুই প্রকার কারণের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে, শরী'আত অনুমোদিত প্রত্যেকটি কারণই স্বাভাবিক কারণ; কিন্তু প্রত্যেকটি স্বাভাবিক কারণই শরী'আত অনুমোদিত কারণ নয়। স্বাভাবিক কারণসমূহের মধ্যে যেগুলি গ্রহণের প্রতি শরী'আত উৎসাহিত করেছে, সেগুলি গ্রহণের অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া। কেননা তিনিই এগুলির মধ্যে বিশেষ গুণ দান

করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি আবার এগুলির গুণ ও বিশেষত্ব উঠিয়েও নিতে পারেন, ঠিক যেমনিভাবে তিনি আগুনের পুড়িয়ে ফেলা বৈশিষ্ট্যটিকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

মোদ্দাকথা: বিভিন্ন কারণ এবং মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে:

এক: ইসলামী শরী'আত কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেনি এমন কোনো কারণকে কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

দুই: ইসলামী শরী'আতে অনুমোদিত কোনো কারণকে কারণ হিসাবে গ্রহণ করলেও তার উপর নির্ভর করা যাবে না; বরং নির্ভর করতে হবে এসব কারণের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র উপর।

তিন: এসব কারণ যতই বড় এবং শক্তিশালী হোক না কেন, এসবগুলির সাথে রয়েছে তাক্বদীরের নিবিড় সম্পর্ক; এসব কারণ তাক্বদীরের বাইরে নয়। সুতরাং আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা সেগুলিতে কর্তৃত্ব করে থাকেন।

তাবীয জড় পদার্থ, যার নিজস্ব কোনো প্রভাব নেই এবং রোগমুক্তির সাথে যার সামান্যতম কোনো সম্পর্কও নেই। কেননা আল্লাহ তাবীযকে অকল্যাণ দূরীকরণের কারণ হিসাবে যেমন নির্ধারণ করেন নি, তেমনি তা স্বাভাবিক কারণ হিসাবেও

পরিগণিত নয়। সেজন্য তাবীযের উপর নির্ভর করার অর্থ হচ্ছে মুশরিকদের মত মৃত ব্যক্তি, মূর্তি ইত্যাদির উপর নির্ভর করা, যেগুলি শোনে না, দেখে না, কোনো লাভ-ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব, তাবীয ব্যবহারকারীকে অবশ্যই শার‘ঈ উপায় গ্রহণ করতে হবে। আর শার‘ঈ উপায়ের মানদণ্ড হচ্ছে, তার সপক্ষে দলীল প্রমাণিত হতে হবে। অতএব, যেহেতু তাবীয রোগমুক্তির কারণ হওয়ার সপক্ষে কোনো দলীল প্রমাণিত হচ্ছে না, সেহেতু তা কখনই রোগমুক্তির কারণ হিসাবে গণ্য হবে না।

তাবীযের সপক্ষে পেশকৃত দু’টি বর্ণনা

১. আমর ইবনে শু‘আইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমের ভেতর ভয় পায়, তখন সে যেন বলে,

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»

তাহলে ঐ ভয়ের বিষয়টি কখনই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না’। সেজন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এই দু‘আটি শিখাতেন। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের গলায় দু‘আটি লিখে ঝুলিয়ে দিতেন[9]।

---

[9] আবু দাঊদ, হা/৩৮৯৩; তিরমিযী, হা/৩৫২৮; আহমাদ, হা/৬৬৯৬।

বস্তুত হাদীসটি দুর্বল। কারণ হাদীছটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রয়েছেন, যিনি ‘মুদাল্লিস’ (مدلس) এবং তিনি হাদীছটিকে ‘আন্‘আনা’ (عنعنة) বা ‘আন্’ (عن) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর কোনো মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ‘আন্’ শব্দের মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

তিরমিযী বলেন, হাদীছটি ‘হাসান-গরীব’।

শাওকানী বলেন, হাদীছটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রয়েছেন, যাঁর সম্বন্ধে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য প্রসিদ্ধ[10]।

আলবানী বলেন, হাদীছটি ‘হাসান’, তবে বর্ণনায় আসা ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকে এই দু‘আটি শিখাতেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের গলায় দু‘আটি লিখে ঝুলিয়ে দিতেন’ হাদীছের এ বাক্য ছাড়া[11]। অতএব, হাদীছের উল্লেখিত বাক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, বালা-মুছীবত আসার আগে যা ঝুলানো হয়, তা হচ্ছে তাবীয। কিন্তু বালা-মুছীবত আসার পরে যা ঝুলানো হয়, তা তাবীয নয়।

---

[10] ফাতহুল ক্বাদীর, হা/৩৫৮৮।

[11] (ছহীহ তিরমিযী হা/৩৫২৮; সিলসিলা ছহীহাহ, ১/৫২৯)।

উক্ত বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআন থেকে তৈরীকৃত তাবীয। তাঁর মতে, বালা-মুছীবত এসে যাওয়ার পরে কুরআনের আয়াত তাবীয হিসাবে ঝুলানো যাবে, বালা-মুছীবত আসার আগে নয়। উক্ত বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর সর্ব প্রকার তাবীযের বৈধতা প্রদান উদ্দেশ্য নয়। কেননা কুরআন দিয়ে তৈরী তাবীয ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার তাবীয যে সর্বাবস্থায় শির্ক তা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত ব্যক্তিত্বের কাছে গোপন থাকার কথা নয়।

শরী‘আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গ

শরী‘আত নির্দেশিত পদ্ধতিতে কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ থেকে গৃহীত দু‘আর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে আক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় যে ঝাড়-ফুঁক করা হয়, তা-ই শরী‘আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক। ইসলামী শরী‘আতে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এই ঝাড়-ফুঁক বৈধ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেমন ঝাড়-ফুঁক করেছেন, তেমনি তিনি ঝাড়-ফুঁক নিয়েছেন। ‘আউফ ইবনে মালেক আল-আশজা‘ঈ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, জাহেলী যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। ইসলাম পরবর্তী যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? তিনি

বললেন, ‘তোমাদের ঝাড়-ফুঁকে পঠিত বিষয়গুলিকে আমার কাছে পেশ কর। ঝাড়-ফুঁকে যদি শির্কের সংমিশ্রণ না থাকে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই’[12]।

ঝাড়-ফুঁকের প্রকারভেদ: ঝাড়-ফুঁক সাধারণতঃ চার রকমের হয়ে থাকে:

১. শির্কী ও কুফরী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা অথবা উপকার-অপকারকে ঝাড়-ফুঁকের দিকে সম্পর্কিত করা। এই প্রকারের ঝাড়-ফুঁক কুফর এবং শির্ক বলে গণ্য।

২. এমন কিছু শব্দের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা, যার অর্থ বোধগম্য নয়। এই প্রকারের ঝাড়-ফুঁক শির্কের মাধ্যম এবং হারাম।

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম, যেমন: ফেরেশতা, নবী বা ইসলামে সম্মানিত অন্য কারো নামের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা। এই প্রকার ঝাড়-ফুঁকও বৈধ নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করার যে বিধান, এই প্রকার ঝাড়-ফুঁকেরও সেই একই বিধান।

৪. আল্লাহ্‌র নাম বা তাঁর কালাম অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম **প্রদর্শিত হাদীছের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা। এই প্রকার ঝাড়-ফুঁক শরী‘আতসম্মত।**

---

[12] (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০)।

শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের শর্ত: ঝাড়-ফুঁক শরী'আত সম্মত হতে হলে তাতে বেশ কিছু শর্ত থাকা যরূরী। যেমন:

(১) ঝাড়-ফুঁক আরবী ভাষায় অথবা যে কোনো বোধগম্য ভাষায় হতে হবে।

(২) ঝাড়-ফুঁকে যা পড়া হবে, তা শরী'আতে অনুমোদিত হতে হবে।

(৩) ঝাড়-ফুঁকের যে নিজস্ব কোনো প্রভাব এবং ক্ষমতা নেই, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

শরী'আতসম্মত ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি: কুরআন-হাদীছের বহু দলীল প্রমাণ করে যে, নিজের জন্য নিজের ঝাড়-ফুঁক সবচেয়ে বেশী উপকারী, যদিও মানুষ এর বিপরীতটা মনে করে এবং ঝাড়-ফুঁক প্রদানকারীকে খুঁজে বেড়ায়। এক্ষেত্রে তারা এমনকি মূর্খ, ভেলকিবাজ বা জাদুকরের কাছে যেতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। শার'ঈ ঝাড়-ফুঁক চোখ লাগা, জাদু এবং নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক অসুখ-বিসুখ দূরীকরণে ফলপ্রসূ। চিকিৎসা বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি চিকিৎসা জগৎ, সেহেতু এখানেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের গুরুত্ব কম নয়। অতএব, ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতি যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপকারী প্রমাণিত হয় এবং তাতে শরী'আত পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকে, তবে তা বৈধ। যাহোক, বিভিন্নভাবে ঝাড়-ফুঁক করা যেতে পারে। যেমন:

১. রোগীর গায়ে ফুঁ এবং হাত দিয়ে স্পর্শ ছাড়াই আয়াত বা মাসনূন দু‘আ পড়া। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো রোগী দেখতে যেতেন বা তাঁর কাছে রোগী আনা হত, তখন তিনি বলতেন,

«أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا»[١٣]

২. রোগীর গায়ে হাত দিয়ে স্পর্শসহ আয়াত বা মাসনূন দু‘আ পড়া। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ঝাড়-ফুঁক করলে তাকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলতেন,

«أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا»[١٤]

৩. স্পর্শ এবং ফুঁসহ আয়াত বা মাসনূন দু‘আ পড়া। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থতা অনুভব করতেন, তখন সূরা ইখলাছ, নাস, ফালাক্ব পড়ে নিজের গায়ে ফুঁ দিতেন এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন[15]।

৪. পানিতে বা তেলে আয়াত বা মাসনূন দু‘আ পড়ে তা পান করা বা

---

[13] (বুখারী, হা/৫৬৭৫)।

[14] (বুখারী, হা/৫৭৫০)।

[15] (বুখারী, হা/৫৭৫১; মুসলিম, হা/২১৯২)।

ব্যবহার করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাবেত ইবনে ক্বায়েস ইবনে শাম্মাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু–এর জন্য পানি পড়ে তা তার গায়ে দিয়ে দেন[16]। আমাদের সালাফে ছালেহীন এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

ঝাড়-ফুঁকের সময় পবিত্র কুরআনের অনেক সূরা ও আয়াত পড়া যায়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

সূরা ফাতেহা: ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সূরা ফাতিহা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদল ছাহাবায়ে কেরাম কোনো এক সফরে ছিলেন। একটি আরব গোত্রের গোত্র প্রধান দংশিত হলে একজন ছাহাবী সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তাকে ঝাড়-ফুঁক করেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সে সুস্থ হয়ে উঠে। খবরটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে পৌঁছলে তিনি তা সমর্থন করেন[17]।

আয়াতুল কুরসী: ঘুমের সময় এবং বাসা-বাড়ীতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় শয়তান ও অন্যদের থেকে রক্ষাকবচ হয়। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তুমি তোমার

---

[16] (আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৫)।

[17] (বুখারী, হা/৫৭৪৯; মুসলিম, হা/২২০১)।

বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে; তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন হেফাযতকারী রাখা হবে এবং শয়তান তোমার নিকটবর্তীও হতে পারবে না[18]।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ আইয়ূব আনছারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বাসা-বাড়ীতে আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাহলে শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না[19]।

সকাল-সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসী পড়লে তা শয়তান থেকে বাঁচার কারণ হয়। কেউ তা সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার হেফাযত করা হয়[20]।

সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস: এ সূরাদ্বয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জিন এবং চোখ লাগা বা বদনযর থেকে হেফাযতকারী। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন ও বদনযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন এই সূরা

---

[18] (বুখারী, হা/২৩১১, ৫০১০)।

[19] (তিরমিযী, আহমাদ, শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ছহীহ তিরমিযী, হা/ ২৮৮০ ও ছহীহ তারগীব ওয়া তারহীব, হা/ ১৪৬৯ দ্র:)।

[20] (ছহীহ তারগীব, হা/ ৬৬২, ১৪৭০; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩২৪৫)।

দু’টি নাযিল হল, তখন তিনি অন্য সবকিছু ছেড়ে এ দু’টি গ্রহণ করলেন[21]।

এ সূরা দু’টি বিভিন্ন বিপদাপদ, বালা-মুছীবত থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার সর্বোত্তম হাতিয়ার[22]।

সূরা এখলাছ, ফালাক্ব ও নাস: এ সূরা তিনটি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এগুলি যে কোনো বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে[23]।

এ সূরা তিনটি বিভিন্ন বিপদাপদ, বালা-মুছীবত থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার সর্বোত্তম হাতিয়ার[24]।

অসুখ-বিসুখ হলে এই সূরাগুলি দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক করতেন[25]।

সূরা কাফেরূন: ঘুমের আগে এই সূরাটি পড়লে তা শির্ক থেকে মুক্তির কারণ হবে। ফারওয়া ইবনে নাওফাল তাঁর পিতা থেকে

---

[21] (আলবানী, ছহীহ তিরমিযী, হা/২০৫৮; ছহীহ ইবনে মাজাহ, হা/২৮৪৬)।

[22] (আলবানী, ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/১৪৬৩)।

[23] (ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/৫০৮২; ছহীহ তিরমিযী, হা/৩৫৭৫)।

[24] (নাসাঈ, হা/৭৮৪৫; হায়ছামী, মাজমা ‘উয-যাওয়ায়েদ, ৭/১৫২, তিনি বলেন, হাদীছটি বাযযার বর্ণনা করেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ ছহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী)।

[25] (বুখারী, হা/৫০১৬; মুসলিম, হা/২১৯২)।

বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমি ঘুমানোর সময় পড়তে পারি। তিনি বললেন, তুমি قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমাবে, তাহলে তা শির্ক থেকে মুক্তির কারণ হবে[26]। হাদীছটিতে শির্কের মত মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির পথ বাৎলে দেওয়া হয়েছে।

সূরা বাক্বারা: কোনো বাড়ীতে সূরা বাক্বারা পাঠ করলে শয়তান সেই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়[27]। এই সূরায় যেমন রয়েছে বরকত, তেমনি তা জাদুকরদের শক্তি খর্ব করতে পারে[28]।

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত: যে ব্যক্তি রাতে এই আয়াত দু’টি পড়বে, তার জন্য এ দু’টি বালা-মুছীবত, শয়তান ইত্যাদি থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। আবূ মাসঊদ উক্ববা ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়বে, তার জন্য এ দু’টি যথেষ্ট হবে[29]।

---

[26] (ছহীহ তিরমিযী, হা/৩৪০৩; ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/৫০৫৫)।

[27] (মুসলিম, হা/৭৮০; তিরমিযী, হা/২৮৭৭)।

[28] (মুসলিম, হা/৮০৪)।

[29] (বুখারী, হা/৫০০৮; মুসলিম, হা/৮০৮)।

কোনো গৃহে এই আয়াত দু'টি তিন রাত পড়লে শয়তান ঐ গৃহের নিকটবর্তীও হতে পারবে না[30]।

কোনো রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলবে,

«بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»[৩১]

শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভব করলে ব্যথার স্থানে হাত রেখে ৩ বার بِسْمِ اللهِ বলবে এবং ৭ বার নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে:

«أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

এছাড়া আরো অনেক আয়াত ও দু'আ রয়েছে, যেগুলি দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যায়। অনুরূপভাবে সকাল ও সন্ধ্যায় পঠিতব্য যিকর-আযকার ও দু'আসমূহ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং নানা শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাই, তিনি আমাদেরকে যাবতীয় শির্ক, বিদ'আত, বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে নির্ভেজাল তাওহীদের উপর আমাদের মৃত্যু দান করুন এবং পরকালে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। আমীন!

---

[30] (ছহীহ তিরমিযী, হা/২৮৮২; হাকেম, ২/২৬০)।

[31] (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৮৬)।